বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

কিশোর অ্যাডভেঞ্চার
হীরা মানিক জ্বলে
চাঁদের পাহাড়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

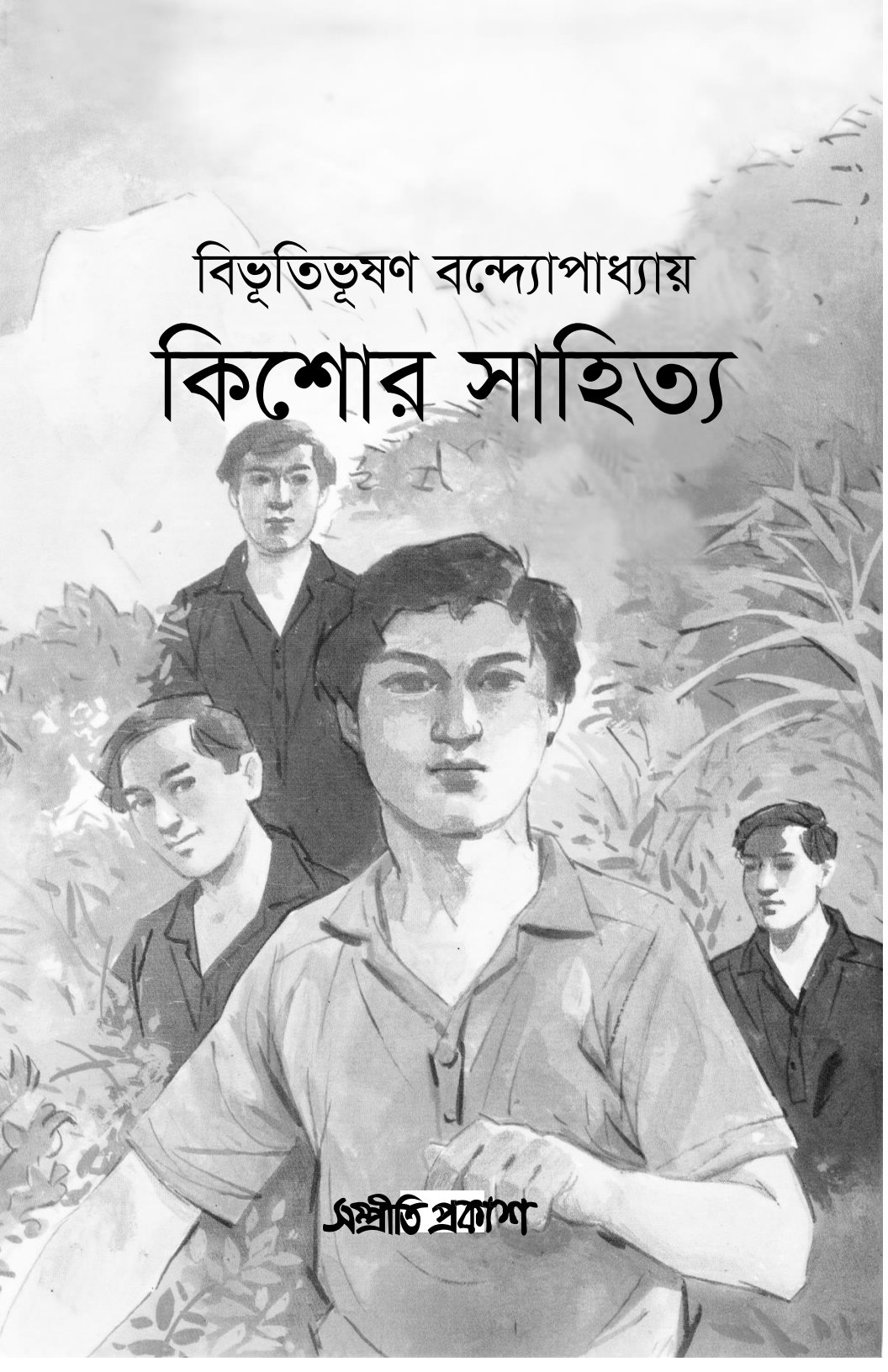

সম্প্রীতি প্রকাশ

কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

হীরা মানিক জ্বলে

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো তেরো মাইল, রেল স্টেশন থেকেও সাত আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মতো না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্যন্ত বড়োলোক বলে গণ্য, যদিও ভাঙা পূজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ির যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ির মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়ি বসে আছে—বড়ো বংশের ছেলে, তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও চাকরি করেন নি, সুতরাং বাড়ি বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক, এই ছিল বড়ির সকলেই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীল তাই করে আসছে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশি নেই—আগে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরি করে—বড়ো বড়ো বাড়ি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব-সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমি দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছেলেন এঁরা।

কালের বিপর্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভালো চাকুরি করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ি কেউ বড়ো একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড়োমানুষি চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস-স্থায়ী পল্লিবাসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পুজোর বেশি দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়ের বড়ো ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ি এসেছে। শোনা যাচ্ছে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধুমধামে নাকি কালীপুজো করবে। অবনী

সরকারি দপ্তরে ভালো চাকুরি করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ সময় বাড়ি আসেন নি, তাঁর মেজো ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সাবডেপুটি—পনেরো দিন ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বললে—মামা, তোমাদের বড়ো শতরঞ্জি আছে?

—একখানা দালানজোড়া শতরঞ্জি তো ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া শতরঞ্জি আমার চলবে না। তাহলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভালো একখানি বড়ো শতরঞ্জি কিনে আনি, বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বার করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!—বড়ো আলো আছে?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক-এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েছে—তাতে চলে তো নিও।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে?

—কেন চলবে না? দেখায় খুব ভালো। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি— রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। কালীপুজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভালোরকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি পাড়াগাঁয়ে এসে এখন অসুবিধে হয়।

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলি তাঁর ছোটো ছেলের একটা চাকুরির জন্যে অবনীর কাছে ক-দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু—ভরসা পেয়েছিলেন, তিনি অমনি বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজি কী রকম জায়গায় থাকো, কী ধরনে থাকো—তা আমার জানা আছে তো! গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি, আর সে কী যত্ন! ওঃ, ইলেক্‌টিরি আলো না হলে কী বাবাজি তোমাদের চলে?

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েছে,—আধুনিক সভ্যতার যুগের নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও শহুর বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বললে, ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভালো—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর-কি!

—ওহে যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্মা বসে থাকত আর হাতিতে চড়ে জরদ্‌গবের মতো ঘুরে বেড়াতো—ওসব চাল ছিল সে কালের। মডার্ন যুগে ওসব অচল, বুঝলে মামা? এ হল প্রগতির যুগ—হাতির বদলে এসেছে ইলেকট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদি পুরোনো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বললে— কেন, হাতি চড়াটা কী খারাপ দেখলে?

—রামোঃ! জবজড়ং ব্যাপার! হাতির মতো মোটা জানোয়ারের ওপর বসে-থাকা পেটমোটা নাদুস-নুদুস—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গলী বললেন—গোবর-গণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়,কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত, সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিচের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটর বাইক বা মোটর কার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্ছে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বললে—স্মার্ট কারা জানি নে; মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মতো বীর হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত—তারা স্মাট হল না—হল তোমাদের কলকাতার আদ্দির-পাঞ্জাবি-পরা চশমা-চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে হাওয়া খায়—কিংবা শখে পড়ে দু-দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা?

অত বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারা হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করত, পুরুরাজ হাতির পিঠে চড়ে আলেকজাণ্ডারের গ্রিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হল সিনেমার ছোকরা অ্যাক্টরের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরন-ধারণ তার ভালো লাগে নি—দূর সম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোনকালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কী যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ সুশীলের মনে হল তাকে লক্ষ করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ-বড়োলোকের দল, পুরোনো বংশের ওপর এদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্মাও বটে। বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেটমোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনও কেউ চাকরি করেছে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পুজোর দালানের সঙ্গের ছোটো কুঠরিতে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ের তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরোনো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বললেন—কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোনো ভাবনা ছিল যে চাকুরি করবে?

—ছেলেরা কী করত জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—তবে আজকাল বড়ো খারাপ সময় পড়েছে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে। কী আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরি না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল চলে আসছে বাড়ি বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি।

মামার বাড়ি খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়োলোক হয়ে চাল দেওয়া কথাবার্তায় সেই বংশকেই ছোটো করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেকি পুজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিম্‌টিম্ করে সমাধা হল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ি যে কালীপুজো হল—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপুজোর রাত্রে গাঁ-সুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ি সন্দেশ খেলে। টিন-টিন দামি সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্লাইড দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এ গাঁয়ে এমনটি আর কখনো হয় নি—কেউ দেখে নি! সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেই সঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোটো করে না দিত।

—নাঃ, মুস্তফিরা কখনও এদের সঙ্গে দাঁড়ায়? বলে—কিসে আর কিসে!

—যা বলেছ ভায়া! নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধু লম্বা-লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই।

এ-ধরনের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরছে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বললেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব একহাত নিয়েছে অবনী! অপরজন বললে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ি বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে? লেখাপড়া তো একটা ছেলেও ভালো করে শিখলে না—

—লেখাপড়া শিখেও তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনও কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আলসে আর কুঁড়ে।

কথাটা সুশীলের মনে লাগল। এদিক থেকে সে কোনোদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকত, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটির নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের স্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরি ছেড়ে মালচালানি ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেছে, একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছে—তার পেছনে গ্রামের তরুণদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেছে।

সুশীল বললে— প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে?

প্রমথ আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে—কেন বল তো? হঠাৎ এ কথা কেন তোমার মুখে?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাব?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনও অন্য কাজ করেনি, তাই বলছি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটল কেন তোমার?

—সে বলব পরে। আপাতত একটা হিল্লে করে দাও তো!

—ওর মধ্যে কঠিন আর কি। যেদিন ইচ্ছে এসো, বাবার কাছে নিয়ে যাব।

মাসখানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগল, কিন্তু ক্রমশ সে দেখলে, ভূষি মাল চালানির কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেন নি, বরং বলেছিলেন ব্যবসার কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কীরকম হচ্ছে? সুশীল বললে—ও ভালো লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তাহলে কলকাতায় গিয়ে দেখে শুনে এস।

কলকাতায় এস সুশীল দেখলে, ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন চার মাস দেরি। সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু-একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

দিন-পনেরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোনো কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায়

খাবার খরচ লাগত না অবিশ্যি, কিন্তু হাত খরচের জন্যে রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখনে বড়ো টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কী? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েছে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভালো লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়িতে জায়গার কোনো অভাব নেই।

ওপরে নীচে বড়ো বড়ো ঘর আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড়ো একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্না রাত্রে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েছে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চুড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরোনো বৈঠকখানা। এ বৈঠককানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভুষি, ঘুঁটে ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্রমাসে তালনবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পুজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুর-পাড়ের পুরোনো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সেই সময় কি সাপে তাকে কামড়েছে।

হৈ-হৈ হল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগল। কিছু গেল না দেখা। হরি চাকর বললে সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েছে।

ওঝার জন্যে রানীনগরে খবর গেল। রানীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে— প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো। হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু ম্যাচিস্ আছে—ম্যাচিস্?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটি কালোমতো লোক। অন্ধকারে ভালো দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত অবাঙালি লোক বলেই সুশীলের ধারণা হল—কারণ তারাই সাধারণত দেশলাইকে 'ম্যাচিস্' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কি ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হল। লোকটিকে এবার সে ভালো করে দেখে নিয়েছে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল শক্ত-হাত-পা-ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা-তিনেক মাত্র। সুশীল একটু সতর্ক হয়ে সরে বসল। লোকটা ওর কাছে এসে বিনীত সুরে বললে—বাবুজি, দু-আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুশি হয়, হোক না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বললে—বহুৎ মেহেরবানি আপনার বাবু! আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাবো। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভালো বিপদ দেখা যাচ্ছে! পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু পাবার মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়ল।

ও উত্তর দিলে—কলকাতাতেই বাড়ি, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিসে কাজ করেন কিনা, এদিকে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণে এলেন বলে, রেড রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড়ো ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বললে—তুমি কোথায় থাক?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্তার ধরনে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরনের নয় হয়ত। সুশীল বললে—জাহাজে কতদিন খালসিগিরি করছ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছ?

—সব দেশে! যে দেশে বলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেত লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস্ এস্ পেনগুইন, এস্ এস্ গোলকুণ্ডা—এস্ এস্ নলডেরা, পিয়েনোর বড়ো জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেচেন?

'পিয়েনো' কি জিনিস, পল্লীগ্রামের সুশীল তা বুঝতে পারলে না? না, ওসব নাম সে শোনেনি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাবো না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়ল, জাহাজ থেকে ডিস্চার্জ করে দিলে। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারিনি। কী করবো, নসিব বাবুজি!

—জাহাজের কাজ আবার পাবে না?

—পাবো বাবুজি, ডিসচার্জ সার্টিক্-ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড়-পাকড়ে বললাম—সাহেব আমার রোটি মেরো না। ওকথা লিখ না!

লোকটি আর-একটু কাছে এসে ঘেঁষে বসল। বললে—আমার নাসিব খারাপ বাবু— নয়তো আমায় আজ চাকরি করে খেতে হবে কেন? আজ তো আমি রাজা!

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলে—কি রকম?

লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বললে—আজ আর বলব না।। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন?

—কেন পারব না?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন?

সুশীল একটু আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, কী লেখা?

—সে কাল বাৎলাবো। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে বেলা থাকতে আসেবেন—সুরয ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক-একবার তার মনে হল, জাহাজি মাল্লা কত দূর কত দেশে ঘুরেছে, কোনো এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে? কোনো নূতন দেশের কথা? পুরোনো লেখা কিসের?...

ওর ছোটো মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উশখুশ করার পরে সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। বললে—দাদা চা খাবে? চা করব?

—এত রাত্তিরে চা কী রে?

—কী করি বল। ঘুম আসছে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভালো, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে, কলেজ-টিমের বড়ো বড়ো ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনৎ-এর আর একটা গুণ, ভয় বলে কোনো জিনিস নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোনো কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দুবার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জেন্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথ-তলায় একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার ছুরিতে প্রায় প্রাণ দিয়েছিল আর কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বললে—সনৎ, কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবছিস?

—দেখি দাদা। বি এস সি পর্যন্ত পড়ে একটা কারকখানায় ঢুকে কাজ শিখব। কলকব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোনো ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই?

—নিশ্চয়ই থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড়ো ইচ্ছে কিন্তু। কী ব্যবসা করবে ভাবছ দাদা?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এসব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাবো ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল্ আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবে না সে লোক? হয়ত নয়। কি একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে এমন সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লোকটা ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড়ো দেরি হয়ে গেল। এই দেখুন—

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারি একটা জিনিস চলে গিয়ছে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বললে—এঃ, কী হয়েছে পায়ে?

—এইজন্যেই দেরি হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর একটা ভারি হাতে-ঠেলা গাড়ি পায়ের ওপর এসে পড়ল। দু-জন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখছি সাঙ্ঘাতিক লেগেছে! না এলেই পারতে!

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিক্‌শা করে এসেছি বাবুজি, দাঁড়াতে পারছি নে!

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়ল। বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোনো কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই:—

তার বাড়ি আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাঙলা দেশে আছে এবং বাঙালি খালাসিদের সঙ্গে কাজ করে বাঙলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল-কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময়ে একবার তাদের জাহাজ ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজসুদ্ধ লোকের কলেরা হল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোটো ছোটো—লাল কাঁকড়া।

—তারপর?

—দুজন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজি, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনিয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে— মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বললে— আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোল ডেকের ঢাকনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব খুব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামাতে গেল।

ডেভিট থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙল না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছে।।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ করেছিল। সারা রাত নৌকো বাইবার পর ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরনের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই কোনোদিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুদিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরনের অম্ল- মধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড়ো সিংহদরজা—কিন্তু বড়ো বড়ো লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড়ো পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড়ো মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সে চেনে। এক্ষেত্রে হয়ত সে ঠিক চিনতে পারেনি—তবে তার ওইরকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংহদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড়ো বড়ো কাছির মতো লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্বত্র। একটা বড়ো ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড়ো মূর্তি দেখেছিল—প্রায় আট দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড়ো ভয় হয়ে গেল। এসব প্রাচীন কালের নগর শহর... জিন পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিক্ষমুনি'।

বিক্ষমুনি বড়ো ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিক্ষমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপে ঝোপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিক্ষমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে তাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ! তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল একমনে শুনছিল,—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার দু'দিন তিনদিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া-ভর্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজী? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাব কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে না সত্যি কথা বলছে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড়ো পরীক্ষা। সুশীল জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়িতে আগে নানারকম পাখি, বেঁজি, খরগোশ, শজারু ও বাঁদর পুষত। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলত, 'মস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধে ইংরাজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বললে—কত বড়ো বনমানুষ?

—খুব বড়ো বাবুজি।। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিং-এর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখ্ সে দেখলাম।

—কী করে দেখলে?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে! আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্নিওতে গিয়েছিলে কিংবা ওর কাছাকাছি কোনো ছোটো দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলছ—ও হচ্ছে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোনো বনমানুষ ও দেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—দাঁড়ান—দাঁড়ান, বাবুজি, কী জায়গার নাম করলেন আপনি?

—সুমাত্রা আর বোর্নিও—

—ওঃ, বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়লিখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন? আজ দশ-বারো বছর। শেষের নামটা—কী বললেন বাবুজি? বোর্নিও? ঠিক। সুলু সী'র নাম জাহাজি চার্টে দেখবেন। সুলু সী'র কাছাকাছি, এপার ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুত কথা মনে পড়ে যায়। তাজ্জব কথা! আজ দেখছেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে দু-একটা পয়সা ভিক্ষে করছি—কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

—তারপর কী করলে বল না! জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হ্যাঁ, উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে নিজের কেবিনে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্ছে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েছে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েছে—কতক তখনও রয়েছে। ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম! আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম—আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল, কিন্তু বেচারির মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায় নি। ওসব দিকের সমুদ্রের জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকত। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম— অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে।। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যা কথা বলছে না, ওর কথার ধরন থেকে সুশীলের তা মনে হল। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনি বললে, তা শেষ পর্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্য সারা গড়ের মাঠ, এমন কি বিরাট কলকাতা শহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বুহ দূরের কোনো বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েছে বহুকালের লুকোনো হীরে-মানিক-মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয়তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরির সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার ভাগে নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসিটা হয়তো লেখাপড়া শেখেনি, হয়তো মার্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার বড়ো বড়ো নগর বন্দর, বড়ো বড়ো দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখেনি—এ একটা পুরুষ মানুষ বটে—কত বিপদে পড়েছে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে!

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের দুঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের দুঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদের তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরাম প্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।